কবি

লিট্‌ল কবিতাপত্র

হেমন্ত সংখ্যা

সম্পাদক
র. আমিন

প্রচ্ছদ
সংগৃহীত

প্রকাশক
Amazon.com Inc., USA

কবিতা
জহুরুল আলম - ০৩
হিল্লোল তালুকদার - ০৪
রশিদ হারুন - ০৫
কাজী রাশেদ - ০৬
সাফিকা জহুরা জেসী - ০৭
রিনি মোহসীনা - ০৭
সাহানাজ শারমিন - ০৮
মোঃ আসাদুজ্জামান আসলাম - ০৮
রেদওয়ান আহমেদ বর্ণ - ০৯
মোঃ ইসহাক মিয়া - ০৯
লুৎফর রহমান শান্ত - ১০
মামুন মাসুম - ১১
আবুল কালাম আজাদ - ১১
এম. এন. এস তুর্কী - ১২
ডালিয়া শারমিন - ১৩
জান্নাতুল ফেরদাউস - ১৪
প্রতিমা চ্যাটার্জী - ১৫
শঙ্কর তালুকদার - ১৫
Ashim Pandit - ১৬
হাসিনা সোমা - ১৬
কনক লতা মন্ডল - ১৭
মাসুদ রানা মাসুদ - ১৮
সাদমান সজীব - ১৯

ছোট গল্প - ২০
জহুরুল আলম

গোয়েন্দা কমিকস - ২২
কাবেরী আক্তার

গ্রন্থ সমালোচনা - ২৩
র আমিন-এর 'বর্ণমালার ঘরসংসার'

চিত্রকর্ম - ২৪
টুটুল আহমেদ

সঙ্গীত সন্ধ্যা - ২৫
শিলুর রহমান, কাজী মিরা ও সাহানাজ শারমিন

ভ্রমন - ২৬
Shaharina Chowdhury's
শাপলার বিল
Roubon Binnoor's
বন পাহাড় আর খাল বিলের দেশে ঘুরে ফেরা

কবিতা

জহুরুল আলম
মনে রেখো

যবে মোর যাওয়া চলে শীতের সকালে ফেলে
যা কিছু আমারে দিয়ে গেলে,
তোমার হাজার গান, সহস্র অভিমান,
শত অনুরোধ পিছনে ফেলে।
তখন কি পড়িবে মনে, সেদিন ভরা ফাগুনে
হিয়া মেলে দেয়া নিরজনে ?
প্রথম মিলন প্রহর, পরানে বহানো ঝড়
মন্দ বসন্ত সমীরণে !
স্মরণে রহিবে মনে ? মোদের সকল কাননে
সেদিন কতনা কলতানে
মুখর ছিলো পাখি, বুঝিবা মোদেরি লাগি
মেতেছিলো কুহু-কেকা গানে।
ফাগুন প্রসারি ডানা উড়িলো কোথা অজানা,
সাথে রহা শুধু তুমি-আমি,
চৈত্র প্রদাহ না বহা, কালবোশেখী না প্রবাহা,
বসন্তানন্দে নিশি-যামী।
তুমি যে আমার হলে, কত সুধা প্রবাহিলে !
দিবা-নিশি প্রহরে প্রহরে,
কভু আনন্দগানে, কভুও বা অভিমানে
সুখানন্দ অবিরতধারে।
তোমার অশ্রু, যবে পরানে ব্যথা নীরবে
বহালো তোমাতে নিরজনে,
আমার সে ক্ষণে প্রাণে ফাগুন ভাসা শ্রাবণে,
আঁখিলোর প্রাণের গহীনে।
আজি এ বিদায় ক্ষণে তুমি কি স্মরিছ মনে :
কত শত স্মৃতি বহা প্রাণে ?
অনন্ত-পাড় দেখা, তোমারে ফেলিয়া একা ;
মনে রেখো মোরে তব গানে।
আমি তোমার হলাম, তোমারি সদাই ছিলাম,
তোমারি সদাই রয়ে যাওয়া,
এ যাওয়া না ফেলে যাওয়া, তোমারি আকাশে রওয়া,
অন্তিমে তোহে ফিরে পাওয়া।

হিল্লোল তালুকদার
চিঠি'র আত্মকথা

আমি, তোমাদের স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া
চিঠি বলছি........
কত সাচ্ছন্দ্যে তোমরা আমায় ভুলে গেলে !!!
প্রযুক্তি তোমাদের অলস করে দিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছে আমায়।
আজ কতভাবে,কত দ্রুত তোমরা একে অপরের কাছে বার্তা পৌঁছে দাও,
অথচ একসময় আমিই ছিলাম তোমাদের ভরসা।
পোস্টকার্ডে, খাকি, হলুদ, নীল খামে বন্দী করে
আমাকে ফেলে দিতে ডাকবাক্সে।
রানারের হাত ঘুরে আমি পৌঁছে যেতাম গন্তব্যে,
তোমাদের সুখ, দুঃখের খবর নিয়ে।
কত মা প্রতীক্ষায় থাকতো ডাকপিয়নের !!!
কত বাবা মাইলের পর মাইল হেটে খোঁজ নিতো পোস্টঅফিসে।
কত নববধূ কান পেতে থাকতো
ডাকপিয়নের "চিঠি আছে গো,চিঠি" হাক শুনতে।
কত প্রেয়সীর হৃদয়ে ঝংকার তুলতো
ডাকপিয়নের সাইকেলের টুং টাং শব্দ।
পত্র মিতালীতে কত অজানাকে জানতে,
কত অপরিচিত জন হতো পরিচিত।
কত রঙে, কত ঢংয়ে লিখতে আমায়,
কত আবেগ জড়ানো সে লেখা......
মা'র কাছে ছেলের বিদেশ বিভুইয়ে কষ্টগাথা,
বাবার কাছে কন্যার নাইওর নেয়ার আকুতি,
প্রিয়তম স্বামীকে বাড়ি আসার অনুরোধ,
এসবে কত আবেগ জড়ানো ছিলো !!!!
তোমরা এখনো একে অপরকে খবর পাঠাও,
কিন্তু একটা চিঠি প্রাপ্তির প্রত্যাশার যে আবেগ,
তা তোমরা ভুলে গিয়েছ।
তোমাদের নবীন কিংবা দক্ষ হাতের এলোমেলো,
ভুল লেখাতেও আমার কোনো অভিযোগ ছিলো না।
এখন আর কোন প্রেয়সী হাতের আঙুল কেটে
কিংবা চিঠির ভাজে সুগন্ধি গোলাপ পাপড়ি রেখে
প্রিয়তমকে চিঠি লিখে না।
আমার প্রয়োজন যেমন ফুরিয়েছে
তেমনি ফুরিয়েছে আমার ব্যবহারও,
আমি আমাকে ব্যবহারের দাবি করছি না,
শুধু বলতে এসেছি........
আমাকে ব্যবহারের সময় যে শ্রদ্ধা, সম্মান তোমাদের ছিলো,
যে স্বচ্ছ আবেগের তাড়নায় নিজে প্রস্ফুটিত হয়ে
আলোকিত করতে সমাজ......
তোমরা সেই ধারায় ফিরে এসো......
ফিরিয়ে আনো মানবতা, ফিরিয়ে আনো হৃদ্যতা।

রশিদ হারুন

এ কেমন শহর !

মনোলীনা,
এ কেমন শহরে থাকো তুমি,
আমার আকাশ থেমে যায়,
রাজপথের যানজটে, বাসের সিটে !
বাসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে,
আকাশটাকে কেবলই মনে হয় মরা নদী,
এতো মানুষের ভীড় এই শহরে !
মেঘের গায়েও লেগে যায় মানুষের শরীরের গন্ধ।
মনোলীনা,
প্রচণ্ড ইচ্ছে করে
দৌঁড়ে অচল আমার আকাশটাকে
আবার সচল করে দেই।
এই শহরে মানুষের শরীরে শরীর লেগে
তৈরি হয়ে গেছে অদৃশ্য এক দেয়াল।
এ দেয়াল আটকে দেয় আমাকে,
আটকে দেয় আমার আকাশ।
চারদিকে এতো মানুষ
আর যানজটের তীব্র চিৎকার,
আমাকে বিরহী করে-
তীব্র বিরহী।
এই শহরের মানুষ
অন্য কারো আকাশের কথা
একবারও জানতে চায়না!
মনোলীনা,
এই শহরের একজন মানুষও আমাকে ডেকে
একটিবারের জন্য জানতেও চায়না
বাসের জানালা দিয়ে
আমি কেন শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি ?
এই শহরের মানুষতো জানে না,
ঠিক একই সময়ে
তুমিও তোমার আকাশ দেখছ আমারই মতো,
হয়তো অন্য কোনো ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে থেকে,
অচল কোনো এক বাসের জানালা দিয়ে।
সেই অচল সময়ে,
আমার খুব ইচ্ছে করে চিৎকার করে বলে উঠি,
এই শহরের সব নাগরিকগণ,
"আমার অচল আকাশটাকে একটু
মনোলীনা'র আকাশটা ছুঁতে দিন।"
মনোলীনা,
আবেগহীন এই শহরে তবুও বারবার ফিরে আসি আমি
তীব্র বিরহী হতে,
আর বৃষ্টির জলে ভিজতে.
আমি বাসের জানালা দিয়ে
তাকিয়ে থাকি তোমার শহরের বিষণ্ন আকাশের দিকে,
আর অপেক্ষায় থাকি

শহরের আকাশ কখন একসময়ে কেঁদে উঠবে
শুধু তোমারই জন্য আমার এই অপেক্ষার কষ্টে,
আর ঝরাবে সান্ত্বনার মায়াবী বৃষ্টির ফোঁটা।
যে জলের প্রতিটি ফোঁটায় মিশে আছে
মানুষের শরীরের গন্ধ।
আমি ঠিকই খুঁজে নেবো সেই সব বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা
যেখানে থাকবে শুধু তোমারই শরীরের গন্ধ।
মনোলীনা,
এ কেমন তোমার শহর?
তোমারই শরীর এর গন্ধ এর জন্য
আমাকে বৃষ্টির কাছে হাত পাততে হয় বারবার !

কাজী রাশেদ

পথ থেকে পথে

দিনভর হেটে হেটে আমি,
তোমার কাছেই পৌঁছে যাই,
তোমার ঠিকাণায় পৌছে দেয় আমার পথ,
আমি চাই বা না চাই -
আমার সমস্ত পথ,
আমার সমস্ত মঞ্জিল,
ঘুরে ফিরে তোমার কাছেই যেনো আবদ্ধ,
অন্য সব ঠিকাণা এসে,
মিশে যেতে থাকে তোমার হৃদাকাশে।
আমি নদীর কাছে গিয়ে,
পাহাড়ের কাছে যেয়ে,
আকাশের দিকে চেয়ে,
শুধু তোমাকেই বার বার দেখি,
শুধু তোমার নামই ধ্বনি প্রতিধ্বনি,
শুধু তোমার কাছেই ফিরে যেতে বলা।
আমার কবিতার খেরোখাতা,
আমার গানের স্বরলিপি,
সারেগামা পাধানিসা
সব ঐক্যতান তোমারই গান গায়,
রবিঠাকুরের সব গান
তোমাতেই মিশে যায়।
আমার চিন্তায়, আমার মননে,
বাস্তবতায় কিংবা স্বপ্নের ধারায়,
ফাগুনের লাল পলাশ শিমুল
অথবা চৈত্রের ঝরে পরা
ছিন্নপাতা, রুদ্রাক্ষ ভরা দুপুর,
আমি এক ক্লান্ত পথিক
ঘুরে ফিরে তোমার পথেই
এসে বলে যাই, ভালবাসি, ভালবাসি।

সাফিকা জহুরা জেসী
ভাসিয়ে নে এবার আমায়

সাগর পারে বসে একাকী আনমনে !
সীমাহীন পারাপার; কত স্বপ্ন, কত প্রশ্ন মনে !
হঠাৎ এক ঢেউ এসে বলল, যাবি !
যাবি ? যেথা কাব্যেরা খেলা করে, ছন্দ নাচে হৃদয়বীণার তালে !
পুলকিত হয়ে যেই না নড়ে উঠি --
কোথা হতে এক ঢেউ এসে, তারে ভাসিয়ে নিল অতলে !
নিরাশ ! হতাশ ! দুচোখ বিস্তীর্ণ আকাশপানে !
কাছে এসে ছুঁয়ে দিয়ে আরেক ঢেউ বলল, যাবি !
যাবি ? যেথা তারারা খেলা করে, কাশেরা দোলে পেখম খুলে !
শিহরিত হল যেই না মন, হারাল স্বপ্নের ঘোরে ;
স্বাধীন ভাবে হাসব গাইব এবার --
চাইতেই দেখি, হারিয়ে গেল সে-ও, আরেক ঢেউয়ের তোড়ে !
ব্যর্থতায়, বিফলতায়, বুকটা যখন পাথর পাহাড় ;
ভিজিয়ে দিয়ে বলল নতুন এক ঢেউ, যাবি !
যাবি ? যেথা ফুলেরা ফোটে, ভোমরা গায়, প্রজাপতি সুখ বিলায় !
বিকশিত হব ! সুবাস ছড়াব ! সৌরভে মাতাব ভুবন !
আশায় মন যেই না বাঁধে ঘর --
হার মানাল আরেক ঢেউয়ে, তারেও করল পর!
ক্লান্ত সূর্য ! রক্তাক্ত গোধূলি ! আশা, স্বপ্ন, সব ধুলোবালি !
কখনও ভাটা, কখনও জোয়ার,পায়ের নিচে কেবলই চোরাবালি !
হৃদয় মরুভূমি; তৃষ্ণার্ত, ক্ষত-বিক্ষত মনের আহাজারি !
শান্ত কেন সকল ঢেউ আজ ?
আয় ঢেউ, একবার আমারটা শোন,
আর পারি না ভাঙা-গড়ায়, ভাসিয়ে নে এবার আমায় !

রিনি মোহসীনা
মেঘকাব্য

তুমি আসবে বলে
প্রজাপতিরা কাব্যের চারপাশে
গুনগুন করছে
তুমি আসবে বলে
সময়গুলো থমকে আছে
এসো প্রিয়া নব সাজে
খুব বাজবে এই যুগলবন্দি।
প্রতীক্ষার প্রহর শেষে
অপেক্ষায় আছি তোমাকে রাঙ্গাবো বলে
এসো প্রিয়া নির্ভরতার দুয়ার খোলা
নিশ্চিত জেনো তুমি রঙ্গিন হবে।

সাহানাজ শারমিন
আমার এখন তুমি নেই

আমার এখন তুমি নেই
তাই আমি এখন আগের থেকে
অনেক ভাল আছি
প্রতারণার চিন্তা নেই
নেই মিথ্যে অভিনয়।
নেই চরম ভাবে আঘাতের ভয়
মরে যাওয়ার মত কাদিয়েছ
দিয়েছ নিষ্ঠুর চাপা যন্ত্রণা
যা দিনে দিনে
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।
আমার এখন তুমি নেই, বলে
সারাক্ষণ তুমি তুমি থেকে মুক্তি পেলাম
আমার এখন তুমি নেই, নেই মানে নেই
আমার কিছুই নেই
নেই বিশ্বাস হারানোর ভয়
কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা
কি অসাধারন যন্ত্রণা
তার কোন ভাষা নেই
আমার এখন তুমি নেই
আসলেই নেই,
সবকিছু শেষ হয়ে গেছে
এখন আর চাওয়া পাওয়া নেই
আমার এখন তুমি নেই।

মোঃ আসাদুজ্জামান আসলাম
হিমাংশুর আলোয়

রূপালী চাঁদ আলো ফেলে নদীর পৃষ্ঠ ঘেঁষে
বায়ু তুফান উঠায় যে ঢেউ ইলিশ তাতে ভাসে।
চাঁদের আলোয় রাস্তা বানায় বিয়ের রঙিন বাতি
মনটা আমার সে পথ ধরে পরীর দেশে চলি।
চাঁদের আলোর পথ পেরিয়ে যাই অরণ্যে দুজন
বসি মোরা তৃণ কানন নেই যে কোনো বারণ।
চাঁদটা হেসে টিপ পড়িয়ে দীপ্ত ছবি আঁকে
ঝিনুক পোকা রূপ জ্বালিয়ে চুমু দেয় যে গালে।
নতুন বস্ত্রের আচ্ছাদনের আংশিক অঙ্গ দেখে
পাখিরা ফুল ছিঁড়ে ফেলে স্পর্শ দেয় নাকে।
জেলেরা তার নৌকা নিয়ে নদীর বাঁকে চলে
হিমাংশু তার আলো বিলায় লঞ্চে যাত্রী নাঁচে।
বিধু হাসে সাথে সাথে বলে মনের কথা
ভালোবাসার জোৎস্না ছড়ায় বক্ষে প্রিয়ার মাথা।

রেদওয়ান আহমেদ বর্ণ
চন্দ্রবিন্দু

এসো সখি ওগো বিদায়ের বেলা -
হাহাকার করো নাহে,
আমারি মনের দুয়ারে খানিক -
মরা অনুভূতি লয়ে,
মেরে কুটে রেখো সুজনা আমারে -
করো মনে যাহা চাহে।
যদি চাহে মনে লয়ে যাও সখি -
তোমারি সে আশ্রয়ে।
ভালোবাসি সখি তোমারি মুখেরে -
ভালোবাসি তব ঘাত,
ছুঁয়ে দেখি হারে গোপনে তোমারে,
মনেরই ভাবনালোকে,
আশারও বেড়িতে যদি পারো ওগো,
বেঁধে রেখে দুটি হাত।
জোছনা এ রাতে তুমিতে আমাতে,
দুটি চোখ রাখো চোখে।
তোমারি দু' আঁখি মুদো'না গো সখি-
আরো কিছু পল চাও,
আজ আমি তবে দু'গালে দু'খানা -
চন্দ্রবিন্দু আঁকি,
ভালোবাসা যতো হিসেবে কি দেবে -
নগদে যা দেবে দাও।
হতাশারও ঘরে বাকির খাতাতে-
বাকিটুক রবে বাকি।

মোঃ ইসহাক মিয়া
প্রশ্ন

পুষ্প ফুটে নিজ ক্ষয়ে / সুবাস ছড়ায়,
দিন শেষে অকাতরে / ঝরিয়া বিলীন।
নদী দিয়ে জল জীবে / পিপাসা মিটায়,
কারো দ্বারে মূল্য নাহি / চাহে কোনদিন।
চাঁদ জোছনায় করে / মোহিত ভুবন,
সরিয়ে আঁধার রাতি / আলোতে হাসায়।
বৃক্ষ মানবের তরে / দেয় অক্সিজেন,
ছায়ায় জুড়িয়ে প্রাণ / প্রকৃতি বাঁচায়।
ভবে কত সৃষ্টিকুল / স্বার্থহীন হয়ে
অকাতরে বিলিয়েই / নিজ শেষ করে।
চাহে না কখনো কিছু / তারা বিনিময়ে
এতটুকু প্রতিদান / কভু কারো দ্বারে।
মানুষ তুমি সৃষ্টির / সেরা জীব হয়ে,
দিয়েছ অন্যের তরে / বিলিয়ে নিজেরে ?

লুৎফর রহমান শান্ত
নীল ছোঁয়া

নিষ্ঠুর দয়িতা তুমি জল্লাদ প্রেয়সি,
পাষন্ড হৃদয়িনী তুমি কঠোর শ্রেয়সী,
প্রতিক্ষণ প্রতিপ্রহর প্রতিটি মুহূর্ত নিঃশ্বাসে
আমি হয়ে উঠি তছনছ
তোমার নিষ্করুন জলোচ্ছ্বাসে।
তুমি হয় দাও প্রেম
না হয় দাও মন
তুমি হয় নাও কাছে
নয়তো ভাবো প্রিয়জন,
আমার পৃথিবী তোমাকে জানায় অভিবাদন,
আমার নীরবতায় লুকিয়ে অজস্র ফুলের সম্ভাষণ।
তোমার দেয়া চাবুকের আঘাত
রক্তের স্রোতে হোক রাঙ্গা
তোমার জীবন ও সৈকতে
তবুও ছুটবে আমার কামনার ডিঙ্গা।
তুমি রোজ আধা ডোজ
দিও নীল ছোঁয়া ভোজ,
রাত জাগা পিপাসার যন্ত্রনা নিয়ে
তারকাদের ফুলে আমি নিবো খোঁজ।
তুমি শায়েরী তুমি ময়ুরী
তুমি নীলাচলের নীলঝর্না
তুমি কবিতার পটে ছন্দ
তুমি গদ্যর পটে উপমা,
তুমি রজত মনে রক্তজবা
আমার সারাটা মনে সুখের ঝর্ণা।
তুমি প্রথমা প্রমদ প্রহরন্তের প্রহসনায় অপরূপ
তুমি নিহারিকা দীপ্তিময় দ্বীপে ফিলিংস স্যুপ।
তুমি হাজার বছর ধরে গল্পের সেই টুনটুনি
তুমি তিতাস একটি নদীর নাম গল্পে কপিলা
তুমি গানে গানে হাজার কবিতার বর্ণের নীলা
তুমি উচ্ছলে তুখোড় মুখরে ভরপুর ঊর্মিলা।
কাননে বসিয়া গুণো প্রহর, ছুয়ো অলীর আচড়
আমার বেলায় সখী তোমার উদ্ভরাত মোচড়।
আমি শান্ত আমি ধীর আমি সহজতর লুঘু
আমি বসন্তের বাহারে পারবো না হতে দুধ-মাছি
কিংবা ঝকঝক চকচক উদ্দীপক গ্রন্হী ঘুঘু।
এ বেলার লেখায় আছি হয়তো কাছাকাছি
কাল হয়তো মিশে যাবো আঁধারে চিরতরে,
আমার কথা যদি দেয় মনে কখনো দোলা
খুঁজে নিও বন্ধুপ্রিয় দূর নক্ষত্রের মাঝারে।

মামুন মাসুম
জন্মান্তরীণ

ক্ষুধার্ত মাছরাঙার মতো শিকার চাইনি
আশ্বিনের ভাটাপড়া জলে
ছুঁইতেও চাইনি তোমার নদীর গভীরতা
পানকৌড়ির মতো ডুবে ডুবে!
তোমার ভাটির স্রোতের তল্লাটে আত্মসমর্পণ করে
অ-বিস্ফোরিত গ্রেনেডে ছোঁয়া সিক্ত আলিঙ্গনে,
বিমুগ্ধতায় সেরে নেয়, চোখ ও বুকের অসুখ
প্লাবিত করি তেতে যাওয়া বুকের জমিন।
প্রতীক্ষার জন্মান্তরীণ অভিশাপের দ্বারে
সহস্র সন্ধ্যা দিন মাস গুণে ঠায় দাঁড়িয়ে
বর্ষার জলের মতো হয়ে উঠি বড় চঞ্চল
তোমার নগরের দুস্তর আলোয়!
আমি নোঙ্গর ফেলি তোমার নগরের বন্দরে
জলপ্রপাতে ব্যথা বিহ্বল আমার অনুরাগ
পরিণত হয় উচ্ছ্বাসের অনিন্দ্য হিল্লোলে
থেমে যায় বিরহী বাঁশির সুর !
তোমার শহরের মানচিত্রে রোজ আমি খুঁজি
সিঁদ কেটে ঢুকে যাওয়ার মত একটা চোরাগলি
যেখানে নিশুতির ভাজে ভাজে
জন্ম নেবে অধিকারের আমৃত্যু ক্ষুধা !

আবুল কালাম আজাদ
দূরপাল্লা

বাস দূরপাল্লা
কংক্রিটের সাথে চলে অতিক্রমের ঘর্ষণ
রাত্রি ভেদ করে চলে সমুদ্রের দিকে
অনাগত কৈফিয়তের দিকে
নিষেধাজ্ঞার চাদর মাড়িয়ে-ট্রাফিক সিগনাল এড়িয়ে
দূরায়ত নক্ষত্রের গ্রামে পৌঁছে যায় কাবুলিওয়ালার বেশে
আখরোটের নেশায়
দ্রাক্ষা প্রেমিক বাতাস দোল দেয় মর্মের মাঝে
ট্রেন ফেল করা যাত্রী মোছে সর্বশেষ ঘাম
তোমাদের দূরপাল্লার সম্পর্কের ছাওনিতে
অবলীলায় আমিও ছিলাম।

এম. এন. এস তুর্কী
বিল হরিণা

নীরবতার সবুজ গালিচা বিছিয়ে
শুয়ে আছো বিল হরিণা তুমি।
চেয়ে আছো যেন
দৃষ্টিনন্দন দৃষ্টিতে আমার দিকে তুমি,
আর তোমার দিকে আমি।
তাই তো আমি তোমার কাছে ফিরে আসি।
তাই তো নিয়ে যায় আমি,
তোমার কাছ থেকে জীবন ভাঙা-গড়ার কঠিন উৎসাহের রসদ !
এ যেন নিজেকে তোমার মাঝে উজ্জীবিত করার মহা প্রয়াস !
এ যেন জীবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে জয় করার বিশাল স্বস্তির নিঃশ্বাস।
জীবন যখন বাস্তবতার সাথে পাঞ্জা ধরে শক্ত মুঠোয় ;
যখন সে জিততে জিততে হেরে যায়,
তখন তোমার করতালির তুমুল শব্দে
আত্মবিশ্বাসের শিরায়-উপশিরায় আগুন ধরিয়ে
স্বপ্ন দেখাও তুমি আরও লম্বা জীবনের ছায়াপথের !
আরও স্বপ্ন দেখিয়ে অন্তরীণ করে বসিয়ে রাখো,
তোমার কোমল পায়ের কাছে চুপটি করে !
তখন আমি পূর্ণ বিজয়ী হয়ে বার্তা সংকেত পাঠাই
আমার মনোজগতের প্রতিটি কোষে কোষে !
আর আমি বেহুস হয়ে তখন খুঁজি জীবন
নীহারিকাপূর্ণ অর্থবহ বইয়ের,
প্রতিটি পাতায় পাতায় তোমায়।
এ যেন শূন্য পাত্রে পূর্ণতার অভিবাদনের
চিক চিক করা ধারণকৃত প্রশান্তির জল ।
আজ আমি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, মানুষ;
দিন দিন তোমার হৃদপিণ্ডকে
একটু একটু করে খেয়ে ফেলছে
তাদের লোভাতুর দাঁত দিয়ে ;
তবুও আমি অসহায় তোমাকে রক্ষার্থে,
অসহায় তোমার পাশে দাঁড়াতে !
হয়তো আগামী অনাগত দিনে
তুমি হারাবে তোমার মাতৃত্ব,
হারাবে তোমার সৌন্দর্য,
হারাবে তোমার স্বাধীনতার খোলা চত্বর !
হবে তুমি ভয়ানক এক
বিপন্ন প্রকৃতির তালিকাভুক্ত বিস্মৃতির বিল !
তখন তোমাকে দেখে, চিনতেও পারবে না আর কেউ !
আমি জানি না, কতকাল ধরে রাখতে পারবে
তোমার এ অস্তিত্ব, কতকাল আগলে রাখবে
তোমার এ অপূর্ব সবুজ সৌন্দর্যের ধু ধু করা তেপান্তরের প্রসারিত মাঠ।
তবে জেনে রেখো,
আজীবন তুমি বসত করবে আমার মনের কুঠিরের সুগভীরে !!

ডালিয়া শারমিন
এভাবেই একদিন

এভাবেই একদিন আমিও চলে যাবো!
চিরতরে নিরব হবো সেদিন।
নিরব হবে আমার যতো হাসি, যতো কান্না।
আনন্দ, দুঃখ, বেদনা আর যতো মান অভিমান।
চলে যাব ঠিক আমার প্রিয় বাবা মায়ের মতো।
চলে যাব ছোট ভাইয়ের মতো,
ছোট ফুফুর মতো।
চলে যাব পরম বন্ধু একমাত্র মামার মতো !
চলে যাব ঠিক পরিবারের অন্যদের মতো।
যারা আমাকে আর আমাদের রেখে ওপারে গেছে,
একদিন তাদেরই মতো !
নিরবে একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে-
এভাবেই চুপিসারে হয়তো !
সেদিন আমার পরিবারের আকাশে-
আষাঢ় শ্রাবণের ঘনকাল মেঘ ছেঁয়ে যাবে।
কালবৈশাখী সে ঝড়ে-
প্রিয়জনকে হারাবার শোকে,
আহাজারিতে বাড়ির পরিবেশ ভারি হয়ে উঠবে!
ভারি হয়ে উঠবে সেদিন;
গোঙানি আর আর্তনাদে আশেপাশের বাতাস।
বিলাপ করবে পাড়া প্রতিবেশিরা।
আর যে বা যার,
কাছে এসে এক নজর দেখার সুযোগ হবে না;
দূর থেকে হযতোবা বুক ভেজাবে চোখের পানিতে।
সাঁতরাবে অশ্রু নদীতে।
সে বোবাকান্না হয়তোবা কাউকে,
দেখাতেও পারবে না সে।
স্মৃতি হাতড়ে গুমরে গুমরে মরবে সারাক্ষণ।
সেদিনটা হয়তো হবে,
কোনো এক শিশির ভেঁজা সকাল,
চৈতালী দুপুর কিংবা পড়ন্ত বিকেল বেলা।
অথবা সন্ধ্যে, কিংবা তাঁরাভরা ঝিঁকিমিকি রাত।
কে জানে হয়তো কোন ঝড়-বৃষ্টির দিনে!
হতেও পারে গভীর রাত্রিবেলা।
চলে যাবো সেদিন চিরতরে...!
চলে যাব পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করে।
এটা আমার সেটা আমার সে সবই ছেড়ে নিরবে,
সারাক্ষণ বলি যা আমার ভেবে।
ছেড়ে যাব সবাইকে,
যাদেরকে আজ আপন আপন বলি,
সারাক্ষণ আমি মনে মনে ভাবি।
যাদের সাথে চলি।
যাদেরকে এক নজর না দেখলে থাকতে পারিনা।
যা কিছু -
আজ আমার ধন সম্পদ বলে মনে করি!

ছেড়ে যাবো সে সবই।
এসব কিছুই কাজে আসবে না।
এতো যে আমার আমার;
কোনো কিছুই আর সেদিন আমার হবে না।
ছিঁটেফোটাও আমার সঙ্গে যাবে না।
ভালোবেসে কেউ দেবেও না,
শুধু একটা সাদা কাফন ছাড়া।
যেটা আমার প্রাণহীন শরীরটা মোড়াতে লাগবে সেদিন।
দু'দিন পর ওটাও পোকামাকড়ে ছিঁড়ে খাবে।
কালের গ্রহে মিলিয়ে যাবে সবকিছু।
আঁধারের নিরবতার মতোই-
নিস্তব্ধ হবে যা আমার আমার সেদিন সে সবই!
আহা !
কতো যতোনের এ দেহটা -
আত্মাটা দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেই,
মাটির সাথে মিশে যাবে মাটির দেহটা !
এতো আদরের শরীর -
যতো সব পোকামাকড়ের খাবার হবে সেদিন !
এপার ছেড়ে ওপারে-
অনন্তকালের সে পথে হবে আমার যাত্রা !

জান্নাতুল ফেরদাউস

বত্রিশ বছর

বত্রিশ বছর একই সাথে চলা
এক পথ ধরে এক কথা বলা
সময়ের ঘূর্ণিপাকে দুনিয়াময়
সব বদলে যাওয়া 'তুমি ছাড়া'।
আমাদের শুরুটা অচেনা পথ দিয়ে
অচেনা শহর অচেনা এক গলি পথ
তবুও সব কিছু আজ কতো আপন
কেবা বলবে একসময় ছিলেম পর?
মনে হয় যেন এইতো সেদিনের কথা
নতুন মুখ যেন সব নতুন কিছু কথা
কবে যে দুজন এতটা আপন হওয়া !
সত্যি এই দীর্ঘ পথটা যেন সংক্ষিপ্ততা।
দুটো সন্তান সাথে তুমি আর আমি
কবে যে জীবন দিয়েছে বত্রিশে পাড়ি
দুজনার এ দীর্ঘপথ ভালোবাসার সিঁড়ি।
ঝগড়া, রাগারাগি কিবা মত প্রকাশ
সবটায় ছিলো দুজনের সমান প্রকাশ
কভু হয়নি বিবাদ দুজনারই মাঝে
ভালোবাসা, আনন্দ যেন অটুট থাকে।

প্রতিমা চ্যাটার্জী
বাউন্ডুলে

আমি তখন বেশ ছোট,
স্কুলে পড়াশোনা করতে যাই,
আমাদের পাড়ায় একটা ছেলে ছিলো
সবাই তাকে বলতো বাউন্ডুলে,
অনেকটা বড়ো হবার পর বুঝেছিলাম,
কি তার অপরাধ !!
ঝুপড়ির গরীব মানুষদের,
খাবারের ব্যবস্থা করা,
ছোট ছোট বাচ্চাদের জামা কাপড়ের জন্য,
বিত্তশালীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে,
ওদের জামা কাপড় আর পড়াশোনার ব্যবস্থা করা,
ফুটপাতে যে শিশুটি ভুখা পেটে বসে থাকতো, মায়ের অপেক্ষায়
মায়ের কাজ করে আসতে দেরি হলে,
তাকে খাবার দেওয়া,
কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়তো,
তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো,
কিন্তু এইসব পরোপকার করতে গিয়ে,
ওর নিজের পড়াটা আর হয়ে ওঠেনি,
স্কুলের খাতা থেকে নাম কেটে গিয়েছিলো
পড়াশোনার দরবারে শূন্য ছিলো ওর উপস্থিতি,
উস্কোখুস্কো মাথার অবিন্যস্ত চুল,
বড়ো বড়ো দুটো চোখের তারায়,
শুধুমাত্র মানুষের জীবনের জন্যে চিন্তার বিষয় ছিলো,
এই ছেলেটাকেই সবাই বলতো বাউন্ডুলে,
আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখলাম,
সত্যিই কি সে বাউন্ডুলে ছিলো ????

শঙ্কর তালুকদার
কবির হাজার ভাবনা

হাজার ভাবনা এক সাথে আসে,
যায়গা খোঁজে তারা নিজেদের,
কবির ভাবনা কথা-জাল যেন,
ছবি আঁকে শুধু সময়ের !
কত কথা সেথা ভীড় করে দেখি,
তাল লয়ে মিলে তা মন্দ নয় !
অবাক পৃথিবীর সে কালের বোঝা
দেখি- সময়ের ধারায় শুধুই ঋদ্ধ হয় !

Ashim Pandit
বিভীষিকা
"অনামী"

কয়লাও নাকি কালো হীরা এমন কিছু প্রত্যয়
উদযাপনের নামে বিদ্বেষের ভান্ডার সবিনয়,
ত্যাগ মহিমায় মহিমান্বিত পুকুর-ডোবা শুকায়
ভোগ্য না অভোগ্য বুঝতে বুঝতে নত ভুখায়।
ভিখারির বেশে কাঙালের ধন করে যেথা চুরি
সেইক্ষণে সেথায়, কি আছে বলো বাহাদুরি,
দীনের আর্তনাদ চাঁপা দিতে দিতে প্রলয় জাগে
সত্য মিথ্যার বনিবনায় যতো অসহায় ভাগে।
তাৎক্ষণিক ভাবে, লোভাতুর ম্যাগমা বিস্ফোরণ
সেই তো কেবল ধ্বংস সাধন'ই করে আমরণ,
সৃষ্টির বলিরেখায় উইপোকা করে নষ্টে বসবাস
কথিত আছে কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস।
সভ্যতার বিদঘুটে আবিষ্কারে, মোক্ষম রূপান্তর
মরু সাহারার পরিধি বাড়ছে, নেই উপায়ান্তর,
সক্রিয় সাধনায় আদি-অন্তে, হয় শোণিত পানি
দুর্বৃত্তর বলয়ে থেকে ইষ্ট সাধনা নাকি হয়রানি।
নিশিলোক আজ দিনে উদ্ভাসিত, মেকি সভ্যতা
পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরে পাথরে ওই বর্বরতা,
ক্যাকটাসের কোমলতা খুঁজে না পাওয়ার সময়
ধৈর্য্য ধারণের ইতিকথা দিনে পৌঁছায় কোমায়।

হাসিনা সোমা
আমি ইতিহাস

একদিন হবো ইতিহাস,
হাসছো !!
মনে মনে বলছো তুমি কি করে হবে ইতিহাস ?
হা আমি বলছি আমি ইতিহাস.....
ইতিহাস মানে বইয়ের পাতায় শুধু
স্থান পাওয়া নয়
ইতিহাস মানেই শুধু যাদুঘরে রাখা কোন বস্তু নয়।,
ইতিহাস মানে- বিগত সময়
ইতিহাস মানে- বিলুপ্ত সভ্যতা,
ধ্বংসস্তূপ, পোড়ামাটি, জনপদ
অনুসন্ধান প্রত্নতত্ব, লিখিত দলিল,
যা সত্য বলে প্রমাণিত।
তাহলে আমি কি সত্য নয় ??
আমি কি প্রমাণিত দলিল নয় ?
কোন জনপদের ক্ষুদ্র মানব সত্বা নয় ?
আমি কি নেই ?
আমি কি ছিলাম না ?
আমি আছি ....কাল আমি হবো ছিলাম।

আর হে হয়তো আমি নয় কোন কিংবদন্তী,
নয় কোন কবি, নয় কোন বিজ্ঞানী
নয় কোন প্রত্নতাত্বিক....
আমায় নিয়ে হয়তো লিখা হবে না কোন উপাখ্যান।
আমাকে কেউ রাখবে না মনে।
তারপরও ...
এই ধরনী,এই মাটি, বাতাস, চাঁদ, সূর্য
সব সব সাক্ষী আমি আছি, ছিলাম।
তাই আমি ইতিহাস ।
আমি ইতিহাসের কাছে......
হয়তো কোন নয় কোন জীর্ণপাতা,
বা কোন একটি বর্ণ
নয়তো বা কোন বিরাম চিহ্ন
আর কিছু না হয় . ....
এক ক্ষুদ্র বিন্দু কনার মতো তো আমার অস্তিত্ব ছিল ?
এই বিন্দু হয়েই গড়বো ইতিহাসের দুর্গ
আমি ইতিহাসের একটা অধ্যায়
আমি লুকায়িত সত্য,
আমার উপর দাঁড়িয়ে হয় ইতিহাস নির্মাণ।
আমি ইতিহাসের নিরব সাক্ষী,
আমার কাঁধে ভর করে
দাঁড়ায় সে....
আমার অসমাপ্ত আত্মার
নির্বাক আর্তনাদ,
তাই আমিই ইতিহাস।
কালের গর্ভে বিলীন হয় সভ্যতা,
মহাকালের নিমজ্জিত হয় সময়,
থাকে শুধু ইতিহাস...
মাটির গহ্বরে অজস্র ইতিহাস
মাটি চাপা আছে
ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায়
ভবিষ্যত হয় সমৃদ্ধ।
পৃথিবীও একদিন হবে ইতিহাস !
হায় ইতিহাস তুমি জেগে উঠো
মাটির অতল থেকে
বেরিয়ে বলো আমি সত্য
গর্জে উঠো
করো জোরে হুংকা

কনক লতা মন্ডল
সুখ কিনে ফেরা

ব্যস্ত শহর সুনশান গলি
রোদ মাখা ক্লান্ত পিচঢালা পথ
ফেরিওয়ালার হাঁক,
ঘরের কপাট মসৃণ আদলে চৌকাঠ
চিরায়ত সুখ ঘুরে হন্যে উন্মুখ।

নিশিরাত ভোর অন্ধ অমানিশা ঘোর
ঝিঁঝিঁ পোকার বেসুর, জোনাকির রশ্মি,
সুখের নীড়ে বাস একবেলা উপোস
লেকের জলে কিলবিল ব্যাঙাচি নতুন জলে ভাসি।
এলোমেলো নিঃশ্বাস অট্টালিকার দীর্ঘশ্বাস
পাওয়া অবশেষ চাওয়ার নিমেষ,
কাজ খুঁজে মজুর, ব্যকুল হৃদয় বলে হুজুর
মনিবের ঠোঁটে শুষ্ক হাসি কথার সুরে বাঁশি।
দু-চারটে টাকা লক্ষ্মীর ঝাঁপি
ভিক্ষে চাহি দ্বারে,
কলিং বেলের শব্দ, উগ্র মেজাজ অনাবিল সুখ।
গ্রহণে শান্তি পথের শেষে লক্ষ্য।
ঝারবাতির ঝলকানি,
বিরক্তির সুর।
চাওয়া মাত্র অল্প, দু-চারটে টাকা
সুখ কিনে ফিরবো ঝুঁপড়িতে।
ল্যাম্পপোস্টের বাঁকে কাক বসে ডাকে
বর্ণহীন মলিন ঘরের লক্ষ্মী,
ভালোবাসা উপচে পড়ে
শান্তির অস্ত্রোপচার।

মাসুদ রানা মাসুদ
কাব্যিক কলম

এই কলমে যে নানান ধরণ ক্ষুধা,
শব্দের বোঝা নিয়ে বেড়াই জলকাদা,
আমি পাগল,
লোকে বলে ছাগল,
কি যে জঞ্জাল,
কলমে ক্ষুধা আর আঁখিজলের বৃষ্টি,
আমি সৃষ্টি পড়ি শব্দ বুনি ফেলি দৃষ্টি,
এই সমাজ,
উলঙ্গ রূপ সাজ,
হারিয়ে লাজ,
মনুষ্যত্ব চ্যুত বিবেক মন্দের ঘোড়া,
ঐ কলম সৈনিক সত্য প্রচারে কাঁড়া,
কলমে ক্ষুধা,
মিটে না পেয়ে রাঁধা,
আমি তো সাদা,
কলম সৈনিকের নিত্য নির্ভীক কাজ,
সত্যের বাণী দিয়ে শুদ্ধে গড়ি সমাজ,
আঁকড়ে ধরি,
মহাগ্রন্থের দড়ি,
আনন্দ ছাড়ি,
তোমাদের যা খুশি তাই বলতে পার,
কাব্যিক কলমে ক্ষুধা বাড়বে আরও--

সাদমান সজীব

যেদিন আমি থাকবো না

যেদিন আমি থাকবো না
সেদিন এমন কিছু মানুষ থাকবে
যাদের কাছে দিনটি হবে উৎসবের।
তারা বলবে— 'যাক, আপদ বিদায় হলো!'
অথচ কিছুতেই কারো মনে যেনো কষ্ট না লাগে
সে-চেষ্টাতেই জীবন গেলো!
যেদিন আমি থাকবো না
সেদিন ভিজবে তোমার চোখ ধূসর বাস্তবতায়
হতবিহ্বল হবে হৃদয় এক অচেনা মৌনতায়!
তোমার মনে বাজবে তখন বিষণ্ণতার সুর
নাকি তুমিও থাকবে তাদের দলে
আর স্বপ্নসুখে বিভোর?
যেদিন আমি থাকবো না
দেখবে না আর কোথাও তুমি নতুন কোনো লেখা
থাকবে না আর অভিযোগ কোনো লেখা নিয়ে!
ডায়েরিটা সাজবে সেদিন ধুলোর চিত্রকল্পে
দূরের ওই আকাশটাও কাঁদবে শোকে ভীষণ
প্রকৃতি তার ছন্দ হারিয়ে করবে অন্বেষণ।
কখনো যদি ভুল ক'রে আমায় মনে পড়ে
খুলে দিও তুমি জানালা তোমার
আসবো আমি দক্ষিণা হাওয়া হয়ে।
রাশি রাশি যতো মেঘেদের দল
নীল আকাশে ওড়ে
আমাকে তুমি পাবে এদেরই ভিড়ে!
কখনো যদি আমাকে ছোঁয়ার ইচ্ছে জাগে ভীষণ
চ'লে এসো প্রিয় শ্রাবণ সন্ধ্যায়
ভিজবো আমি তোমার সাথে বৃষ্টির জল হয়ে।
যেখানে দেখবে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা
জ'মে আছে এক অদ্‌ভুত সজীবতায়
সেখানেই তুমি পাবে আমায় নিশ্‌চুপ নীরবতায়!
কখনো যদি লাগে তোমার ভীষণ রকম একা
চ'লে এসো তুমি রাতের গভীরে
অগণিত নক্ষত্রের মাঝে পাবে আমার দেখা।
যখন রাতের অন্ধকারে পাবে তুমি ভয়
জোছনা হয়ে আসবো আমি
ভয়কে করতে জয়!
যেদিন আমি থাকবো না
অবহেলিত অসহায় যতো পথশিশু আছে
আমাকে তুমি পাবে তাদের প্রাণোচ্ছল হাসির মাঝে।
আমাকে তুমি আরো পাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে
জগতে যতো দুঃখ-কষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
আমি থাকবো সর্বত্রই যতোদিন তা থাকে!

ছোট গল্প

জহুরুল আলম
বাবেলের দারায়ুস

অতি প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ার বাবেল শহরে দারায়ুস নামে এক ধার্মিক ব্যাক্তি বাস করতো। সে ছিল শহরের ধর্মশালার পুরোহিত। ঈশ্বরের আরাধনায় দারায়ুস নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করেছিল যে অন্য সবাই যখন পার্থিব জীবনের নানাপ্রকার আয়োজনে ব্যাতিব্যাস্ত থাকতো তখন দারায়ুস নির্জনে নিভৃতে ঈশ্বর বন্দনায় ব্যাপৃত থাকতো। এমন কি আহার ও বিশ্রামের সময়ও সে যথারীতি আরাধনায় নিমগ্ন থাকতো। বাবেল শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এক নামে সাধু দারায়ুসকে চিনতো এবং তাকে অত্যন্ত সন্মান করতো। উপাসনালয়ে, বাজারে বা রাস্তায় সর্বত্রই দারায়ুস সকলকে পরমেশ্বরের উপর সর্বদা অটল বিশ্বাস রাখার উপদেশ দিত।
বাবেল শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহমান ছিল খরস্রোতা টাইগ্রিস নদী। প্রতিবছর বর্ষাকালে টাইগ্রিসের পানি দু'কূল ছাপিয়ে প্লাবিত করতো নিম্নাঞ্চলের কৃষি জমি ও বসতভিটা। অতিমাত্রার পাহাড়ী ঢল কোন কোন বৎসর বাবেল শহরকেও প্লাবিত করতো। তখন শহরের নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দারা নিজেদের সহায় সম্বল নিয়ে উত্তরের উঁচু গিলুট পর্বতে আশ্রয় নিতো। যখন পানি নেমে যেতো তখন তারা আবার ফিরে আসতো নিজ নিজ বাড়িঘরে।
একবার মৌসুমি বায়ুর প্রাবল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাবেল শহরের আশে পাশে এবং টাইগ্রিস নদীর উজানে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। নদীর উৎপত্তিস্থলে পাহাড়-ধসের ফলে পানি প্রবল বেগে বাবেল শহরকে প্লাবিত করতে থাকে। তৃতীয় দিনে যথারীতি শহরের নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দারা উপাসনালয়ের সামনের উঁচু পাথরের পথ ধরে গিলুট পর্বতের দিকে চলে যায়। চতুর্থ দিনে বর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং শহরের উঁচু অঞ্চলগুলোতে পানি প্রবেশ করতে থাকে। দারায়ুসের ধর্মশালার সামনের সড়ক পানিতে তলিয়ে যায়, কিন্তু উপাসনালয়টি উঁচু স্থানে থাকায় সেটি তখনো নিরাপদ অবস্থানে ছিল। যাই হোক, দারায়ুসের প্রতিবেশীরা ঘোড়ার গাড়ি, গাধা ও উটের পিঠে মালপত্র বোঝাই করে গিলুট পর্বতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। শহর ত্যাগ করার প্রাক্কালে তারা দারায়ুসকে বললো: 'সাধু দারায়ুস, তুমিও আমাদের সাথে চল। আবহাওয়ার গতিবিধি ক্রমশ:ই বিপদজনক হয়ে উঠছে। এখনি নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। তুমি জিনিষপত্র নিয়ে আমাদের গাড়ীতে বা যে কোন পশুর পিঠে আরোহণ কর। আমরা গিলুট পর্বতে আমাদের সাথে তোমাকেও চাই। এখানে তোমাকে একা এবং অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে পারি না।' দারায়ুস উত্তরে বললো: 'তোমরা আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আমাকে আমার প্রভু রক্ষা করবেন। তিনি আমার সাথে আছেন' এ কথা বলে দারায়ুস যথারীতি উপাসনায় নিমগ্ন হলো। প্রতিবেশীরা অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও এবং বহু সময় অপেক্ষা করা সত্ত্বেও দারায়ুস তাদের সঙ্গী হলো না। অগত্যা বিফল মনোরথ হয়ে সবাই গিলুট পর্বতের দিকে চলে গেল।
সারা রাত এবং তারপর সারা দিন প্রবল বর্ষণের ফলে টাইগ্রিস নদী প্রমত্তা রূপ ধারণ করলো। প্রবল বেগে পানি দু'কূল ছাপিয়ে সকল ঘরবাড়ী ও স্থাপনাসমুহ নিমজ্জিত করতে লাগলো। দারায়ুসের ধর্মশালার ভিতরে অবাধে পানি ঢুকতে লাগলো এবং সন্ধ্যানাগাদ গম্বুজ বাদে সম্পুর্ণ ধর্মশালা পানির নিচে তলিয়ে গেল। দারায়ুস ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে ধর্মশালার গম্বুজের উপর উঠলো। চারিদিকে বিশাল সাগরের মতো স্রোতধারায় পাহারসম ঢেউ উপাসনালয়ের গম্বুজে ক্রমাগত আছড়ে পড়তে লাগলো, সেই সাথে বর্ষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দারায়ুস গিলুট পর্বতের দিকে তাকিয়ে দেখলো অন্ধকারের মাঝে পর্বতের খাঁজে খাঁজে আলোর মেলা। শহরবাসিরা নিরাপদ আশ্রয়ে বসে স্ব স্ব কাজে লিপ্ত আছে দেখে দারায়ুস ঈশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে লাগলো।
গভীররাতে যখন গম্বুজটি তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো তখন একটি নাবিক বোঝাই বিশাল জাহাজ ধর্মশালার নিকটবর্তী হতে থাকে। নাবিকেরা মশাল জ্বেলে দারায়ুসকে নাম ধরে ডাকতে থাকে: 'দারায়ুস, তুমি কোথায়? আমাদের সাথে নিরাপদ আশ্রয়ে চল।' দারায়ুস আগের মতোই উত্তর দেয়: আমাকে নিয়ে ভেব না, আমি ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। আমার প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন।' নাবিকেরা বললো: 'আজ রাতেই তোমার উপাসনালয়ের গম্বুজটি ডুবে যাবে। তুমি আশ্রয়হারা হবে। আমাদের সাথে গিলুট পর্বতে চল।' দারায়ুস যথারীতি বললো: 'আমি ঈশ্বরের উপর ভরসা করি, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। তোমরা যাও, বিদায়।' নাবিকসহ জাহজটি ধীরে ধীরে উত্তর দিকে চলে গেল। দারায়ুস গম্বুজের উপর বসে জাহাজের অপসৃয়মান আলোর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের নাম জপতে লাগলো।

সেই রাতেই উপাসনালয়ের গম্বুজ ডুবে গেল। দারায়ুস দাঁড়িয়ে গম্বুজের উপরের পিতলের শলাকা আঁকড়ে ধরে ঈশ্বরের নাম জপতে লাগলো। শেষ রাতে প্রবল বাতাস আর ঢেউ এবং সেই সাথে প্রবল স্রোত দারায়ুসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দারায়ুস পানিতে ডুবে মারা গেল।
সত্ত্বর দারায়ুসকে ঈশ্বর সমীপে হাজির করা হলো। সেখানে পৌছেই সে সিজদাবনত হয়ে রইলো। তখন ঈশ্বর সত্তর হাজার দেয়ালের অপর প্রান্ত থেকে বললেন: 'গাত্রোত্থান কর, দারায়ুস। পৃথিবীতে তোমার সদাচারণ, ধর্মপালন ও আমার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমায় সন্মানজনক ও সুখী অনন্ত জীবনের বিধান দান করেছি। এই পরলোকে তুমি পরম সুখে কালাতিপাত করতে থাক এবং আমার বন্দনায় সদা নিমগ্ন থাক।'
বিধাতার নির্দেশে দারায়ুস উঠে দাঁড়াল এবং অশ্রুসজল নয়নে বললো: 'হে প্রভু, সারা জনমে আমি কখনো তোমার আদেশ অমান্য করি নাই, তোমার বিধান ভঙ্গ করি নাই। বিশ্বলোকের সকল সৃষ্টির মঙ্গল কামনা করেছি। তোমার উপাসনায় জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত উৎসর্গ করেছি। তবুও, হে ঈশ্বর মনে হয় আরো কত কিছু করার ছিল, আরো বহু কিছু আমি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই নাই। প্রভু তোমার দয়া বিহনে আমার চাওয়ার আর কিছুই ছিল না এবং নাই। আজ এ আনন্দলোকে অনন্তযাত্রার প্রাক্কালে তোমার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি আদেশ করলে তা উপস্থাপন করবো।'
ঈশ্বর বললেন: 'হে আমার প্রিয় দাস, আমি অন্তর্যামী, তোমার জিজ্ঞাস্য আমি জানি। তবুও তোমার প্রশান্তি লাভের জন্য আদেশ করছি, তোমার বক্তব্য বর্ণনা কর।' দারায়ুস বললো: 'প্রভু, প্রবল দূর্যোগের মাঝেও আমি তোমার ভরসা করেছিলাম এবং আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল যে তুমি আমাকে সে দুর্যোগ হতে রক্ষা করে পৃথিবীতে আরো কিছুকাল বিচরণ করে তোমার আরাধনা করার ও মানুষকে তোমার পথে আনার সুযোগ করে দিবে। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে কোনপ্রকার সাহায্য না আসার ফলে আমি অতল বারিতে নিমজ্জিত হয়ে ধরাধাম ত্যাগ করলাম। তুমি কেন আমাকে বিপদকালে ত্যাগ করেছিলে প্রভু?'
ঈশ্বর গভীর স্বরে বললেন: 'আমি কখনোই আমার কোন দাসকে ত্যাগ করি না, সে যতই পাপী হোক না কেন। তোমাকে উদ্ধারের জন্য আমি প্রথমে নিম্নাঞ্চলের ভুক্তভোগীদের তোমার সম্মুখ দিয়ে গিলুট পর্বতে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার সে সাহায্য বুঝতে পার নাই। অত:পর আমি তোমার প্রতিবেশীদের রূপ ধারণ করে তোমার নিকট গমন করেছি এবং বারংবার শকট ও ভারবাহী পশু সমভিব্যহারে নিরাপদ স্থানে চলে আসার আহ্বান জানিয়েছি। তুমি তাও বুঝতে পার নাই। সবশেষে বিশাল নৌযানসহ নাবিকদের মাধ্যমে আমি তোমার ত্রাতার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি নাবিকদের আহ্বানেও সাড়া দাও নাই। ফলত: তুমি নিমজ্জিত হয়েছ। সর্বদা স্মরণে রেখো, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন তা যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক না কেন, এবং তাকে রক্ষা করার জন্য নানা ভাবে নানা উসিলায় সহায়তা প্রেরণ করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির উচিত সে সকল সাহায্য উপযুক্ত সময়ে সম্পুর্ণরূপে গ্রহন করা ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।'

গোয়েন্দা কমিকস

কাবেরী আক্তার
গোয়েন্দী

সারারাত ঘুম হলোনা, কেন জানেন ? আমি গোয়েন্দা হতে চাই। কিন্তু কি করে ? আমি তো মহিলা। শুধুমাত্র এই চিন্তাটাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা উপায় বের করেছি, যতোগুলো গোয়েন্দা আছে, সবগুলোই যখন পুরুষ গোয়েন্দা, তাহলে আমি সবগুলোকে মহিলা বানিয়ে দেবো। এইসব নামের থেকে একটা বেছে নেবো।
১) ফেলুদী (ফেলুদা)
২) বোমাকেশী (বোমকেশ)
৩) শার্লি হোমস (শার্লক হোমস)
৪) মাসুদা রাণী (মাসুদ রানা)
৫) কাকি বুবু (কোকা বাবু)
যথেষ্ট হয়েছে, এর ভেতর থেকে একটা নাম নিজের করে নিলেই হবে।

এবার আসা যাক, আমি কি কি বিষয়ে গোয়েন্দীগীরি করবোঃ-
১)পাশের বাড়ির কেউ যদি বউ পিটায়, ধরুন যৌতুকের জন্য। তুমুল ঝগড়া মারামারির পর, বউ যদি উথাল-পাতাল কান্না শুরু করে, তখন আমি গোয়েন্দীগীরিতে লেগে যাবো। সেখানে আমি প্রচুর রহস্যের গন্ধ পাবো। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেই ছাড়বো, বউয়ের পরকীয়ার কারণে, স্বামী সহ্য করতে না পেরে বেধড়ক পিটিয়েছে।
২)ভাই ভাবির সংসারে যদি অশান্তি লেগে যায়, তাহলে তাদের ঘরের দরজার চিপায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করবো, আসলে ব্যাপারটা কি ? শেষ অবধি বের করে আনবো, এই অশান্তির মূলে আমার ভাবি। ভাইয়েরতো কোন দোষ থাকতে পারেনা তাইনা ? এই ক্ষেত্রে অবশ্য আমাকে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। সব রহস্য কি আর জটিল হয় নাকি।
৩)ফেসবুকের বন্ধুদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবো। কে কে দুঃখের কবিতা লেখে, তার উপর বেশি নজরদারি বাড়াতে হবে। এমন এমন কমেন্টস করবো, যে বাধ্য হয়ে সে তার ব্যাক্তিগত কথা বের করে দেবে। কেন সে এমন দুঃখের কবিতা লিখলো, কি হয়েছিল তার, তারপর কেনই বা এতো দুঃখ পেলো ? সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে আমার গোয়েন্দীগীরিতে।
আপাততঃ এতটুকুই থাক। এতো চাপ একসাথে নিলে, কোন কাজের কাজই হবে না। সবাই দোয়া করবেন, আমি যেন আমার গোয়েন্দাগীরিতে সফলতা অর্জন করতে পারি।

বিঃ দ্রঃ (আমাদের সমাজে এমন হাজারো বিষফোঁড়া গোয়েন্দা গোয়েন্দী আছে, যাদের কারণে সমাজটা আজ উচ্ছন্নে গেছে। আসুন সবাই সরল মনের মানুষ হই,সততার আলো জ্বেলে দেই ঘরে ঘরে।)

গ্রন্থ সমালোচনা

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

বর্ণমালার ঘরসংসার

প্রকাশিতঃ মে ২৬, ২০১৭ ⋮ প্রিন্ট

- **নাজনীন বেগম**

র. আমিনের লেখা বর্ণমালার 'ঘরসংসার' বইটি মুক্তি পায় ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি, ২০১৭তে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ছায়াবীথি। প্রচ্ছদ অঙ্কনে সাদ্দাম হোসেন তানভীর। মাতৃভাষা মানেই বর্ণমালার নিবিড় সংযোগ আর সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা। কবির গ্রন্থটি বাংলার প্রতিটি বর্ণমালার ক্রমানুসারে বর্ণ দ্বারা রচিত কাব্যিক অনুভব। অ দিয়ে শুরু করে শেষ অবধি হ দ্বারা পরিসমাপ্তি। 'অ' দিয়ে লেখা কবিতাটির প্রতিটি লাইনের অদ্যাক্ষর অ দিয়ে শুরু করা হয় যা কবির প্রতিভাস্ফুরণের এক অনুপম দীপ্তি। যা প্রতিটি কবিতার বেলায় প্রযোজ্য। শব্দের অর্থ অনুভবের মাত্রায় কবিতাগুলো ভিন্ন এক আমেজ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে। বর্ণমালার অক্ষর সংযোজনে শব্দচয়নের যে শৈল্পিক সুষমা তা কবির প্রকাশ ভাবনার এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়। প্রতিটি বর্ণকে নিয়ে ভিন্নমাত্রার নান্দনিক পঙক্তি কবিতার ছন্দোবদ্ধ আবহকে পাঠকের কাছে এক অন্য রকম রূপমাধুর্য নিয়ে আসে। বাংলার বর্ণমালার প্রতি কবির এই অনন্য নিবিষ্টতায় অবাক হওয়ার মতো কিছু না থাকলেও পাঠকচিত্ত নতুন এক স্রোতে আন্দোলিত হয়। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মনে হয় বাংলার চিরায়ত বর্ণমালার সমৃদ্ধ অবয়বের অনির্বাণ শিখা। যে আলোকিত শিখা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে, ভাষার প্রতি দরদ জন্মায়। সর্বোপরি এই বর্ণমালার সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ শব্দমালার নিরন্তর গতি পাওয়া তেজোদ্দীপ্ত বাক্যের সমাহার এগিয়ে চলার পথকে নিষ্কণ্টক করে, নির্বিঘ্নে করে। আর এরই প্রমাণ দিয়েছে বাঙালী বর্ণমালার সুরক্ষার জীবনবাজি রেখে। বর্ণমালার অপূর্ব সমাহারে কবিতাগুচ্ছ সাজানোর যে অভিনব এবং চমৎকার শৈল্পিক সত্তার কবিকে প্রাণিত করে তা যেমন মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা একইভাবে কাব্যিক জগতেও এর সুষ্ঠু সংযোজন সৃষ্টিশীলতার এই আঙিনাকে সমৃদ্ধ করে। ভাষার মাসে এমন একটি কবিতার মিছিল পাঠককে উপহার দেয়ার জন্য কবিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন। পাঠক সমাজে গ্রন্থটি আদৃত হবে এই আশা করাই যায়। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

চিত্রকর্ম

Story from the nature
Media : Tea Liquor on Canvas, Size : 2 feet by 3 feet, Year: 2020

চিত্রগুলো এঁকেছেন 'কবি' গ্রুপের **টুটুল আহমেদ**

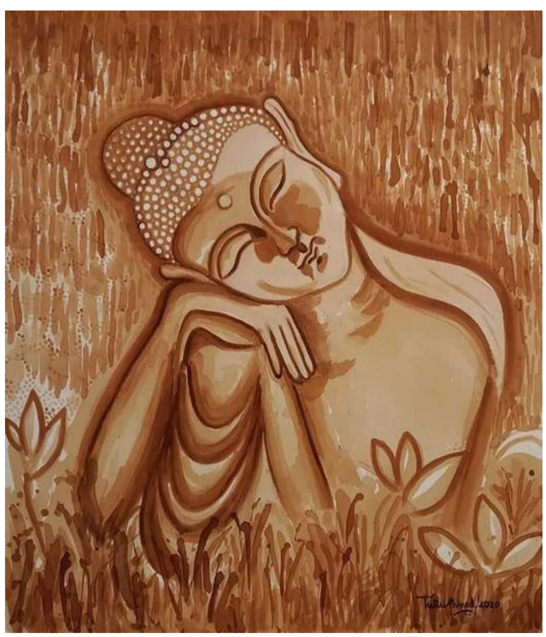

Adolescent Buddha
Media : Tea Liquor on Canvas, Size : 4 feet by 4 feet, Year : 2020

সংগীত সন্ধ্যা

এক 'সঙ্গীত সন্ধ্যা'র আনন্দঘন পরিবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কবি গ্রুপের অন্যতম সদস্য **বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী 'শিলুর রহমান'**, সাথে কবি গ্রুপের অন্য সদস্যরা **গিটারিস্ট 'কাজী মিরা'** এবং **তবলাবাদক 'সাহানাজ শারমিন'**।

ভ্রমন

Shaharina Chowdhury's শাপলার বিল

কাছ থেকে দেখা ---
নয়ন জুড়ানো নৈসর্গিক রূপের রাণী "শাপলার বিল"

" শাপলা"র গ্রাম সাতলা যেন অপরূপা শাপলার এক বিশাল স্বর্গরাজ্য! বিলের পানিতে ফুটে থাকা হাজারো শাপলা যেন সূর্য্যের লাল আভাকেও হার মানায়! সৃষ্টিকর্তার অপার সৌন্দর্য লীলার তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়েছে সমগ্র শাপলার বিল জুড়ে! এক পলকে বিলের দিকে তাকালে মনে হবে, লাল শাপলার কোনো চাদর পুরো বিলজুড়ে বিছানো আছে! তাই গ্রামটির নামই হয়ে গেছে 'শাপলা বিল'। সবাই এই নামে ডাকে উত্তর সাতলা গ্রামটিকে। প্রস্ফুটিত শাপলার রূপ দেখতে খুব ভোরে বিলে উপস্থিত হতে হয়। সূর্য্যের তাপ বাড়ার সাথে সাথে শাপলার দল চোখ বুজে নিজেদের গুটিয়ে ফেলে। বিল জোরা হাজারো শাপলার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় সাদা অপরূপা চন্দ্রাকৃতির ছোট ছোট জলজ ফুল।যার নাম আমি দিয়েছি "চন্দ্রমুখী"! বিলের মাঝে কোথাও কোথাও ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে পানকৌড়ির দল!
আহা!।কী অপরূপ সে নয়ন জুড়ানো দৃশ্য! এরি সাথে যুক্ত হলো মাঝির ধীর বৈঠা বাওয়ার ফাঁকে শাপলা তুলে নৌযাত্রীদের জন্য "শাপলা মুকুট "তৈরি করা। মাঝি যেন তাদের মনের ইচ্ছেটুকু মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল! অন্যকে খুশি করার মাঝির এই বোধটুকুর কাছে সকলে ঋণী হয়ে রইলো!

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নের কালবিলা গ্রামে প্রাকৃতিকভাবেই এই শাপলার অবারিত রঙ্গিন রুপ যে কাউকে মুগ্ধ করবে। রুপসী বাংলার এই রুপের প্রশংসা এখন গ্রাম ছাড়িয়ে দেশ-দেশান্তরে।সাধারণত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এই বিলে লাল শাপলা ফুল ফোটে। আর ওই বিলের জলে ফুটন্ত লাল শাপলা দেখতে জেলা ছাড়িয়ে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন। শিগগিরই এটি দেশের অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিনত হতে পারে বলে স্থানীয়দের ধারণা।বিলের চারপাশে গাঢ় সবুজের পটভূমিতে এ যেন বাংলার এক মুখরিত "লাল স্বর্গ"।

দূর থেকে সবুজের মধ্যে লাল রঙ দেখে মননয়নে সৌন্দর্যের সুধা পানের তরঙ্গ নেচে ওঠে। দূরত্ব কমার সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ফুলের অস্তিত্ব। আগাছা আর লতা পাতায় ভরা বিলে ফুটন্ত কোটি কোটি লাল শাপলা সত্যিই সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বিলের লাল শাপলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে মন ও নয়ন দুটোই জুড়িয়ে যায়। মনোমুগ্ধকর এ বিলের শাপলা দেখতে প্রতিদিন দেশের বিভিন্নস্থান থেকে ছুটে আসছেন ভ্রমন পিপাসু প্রকৃতি প্রেমিরা। এ বিলের শাপলাকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে বিজ্ঞাপন চিত্র। ফলে দিন-দিন দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠছে সাতলার 'শাপলা বিল'।ঠিক কত বছর ধরে বিলে এভাবে শাপলা জন্মাতে শুরু করেছে সঠিকভাবে সে তথ্য কেউ দিতে না পারলেও স্থানীয় ষাটোর্ধ্ব কয়েকজন ব্যক্তি বলেন, তাদের জন্মের পর থেকেই এ বিলে এভাবে শাপলা ফুটতে দেখছেন তারা। বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন এ বিলে লাল, সাদা ও বেগুনি রঙয়ের তিন ধরনের শাপলা জন্মালেও লাল শাপলার আধিক্য বেশি। অধিকাংশ বিলের লাল শাপলার গালিচা শাপলা প্রেমিদের নয়ন সার্থক করে! বিলের যতো ভেতরে এগুতে যাবেন ততোই লালের আধিক্য। এক পর্যায়ে মনে হবে শাপলার রাজ্যে বন্দি হয়ে আছেন আপনি।তাছাড়া শাপলার বিল শুধু সৌন্দর্য্য নয় বিল থেকে শাপলা তুলে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ওইসব এলাকার অসংখ্য পরিবার জীবিকা নির্বাহ করছেন। এখানকার বাসিন্দাদের অনেকেই এই বিলের শাপলার ওপর নির্ভরশীল। এদের কেউ শাপলা তুলে, কেউবা বিল থেকে মাছ শিকার করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ওই এলাকার কয়েক শ' পরিবার বেঁচে আছে এই শাপলাকে কেন্দ্র করেই। এখানে ডিসেম্বর মাসে শুরুর দিকে শীতের মৌসুমে যখন পানি কমে যায় তখন সব শাপলা মরে যায়। ওই সময় কৃষকরা এখানে ধান চাষ করেন। তবে একই সাথে ধান ও শাপলার এই সহাবস্থান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ!

বরিশাল শহর থেকে শাপলা বিলের দূরত্ব ও ভাঙ্গাচোরা রাস্তার যন্ত্রণা যাতায়তে কিছুটা কষ্টকর হলেও শাপলার লাল বেনারসির আঁচল বিছানো বিলের ধারে পৌছানো মাত্র সব কষ্ট, ক্লান্তি এক নিমিষেই যেন হাওয়ায় মিলে গেল!
সার্থক হলো নয়ন! জুড়ালো সৌন্দর্য পিপাসু মন!

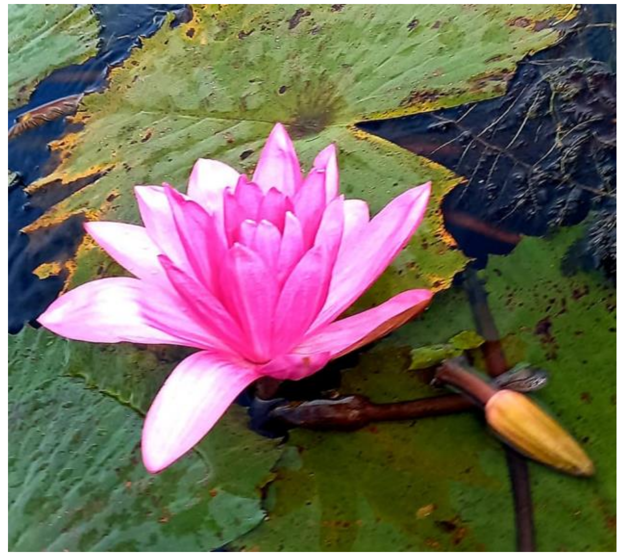

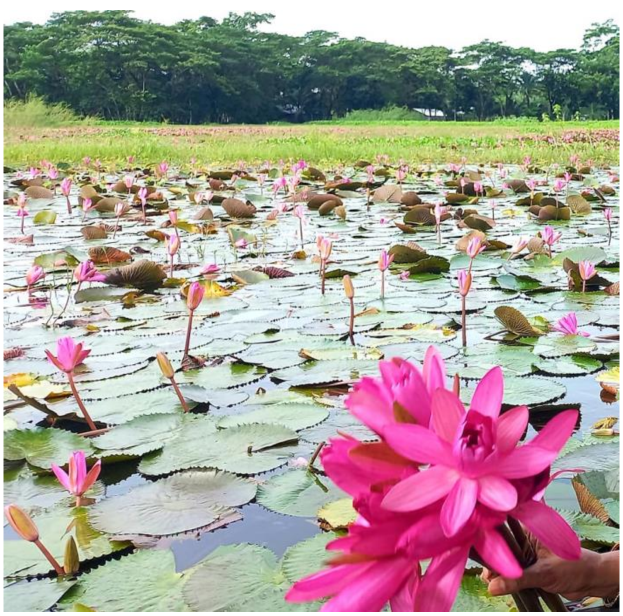

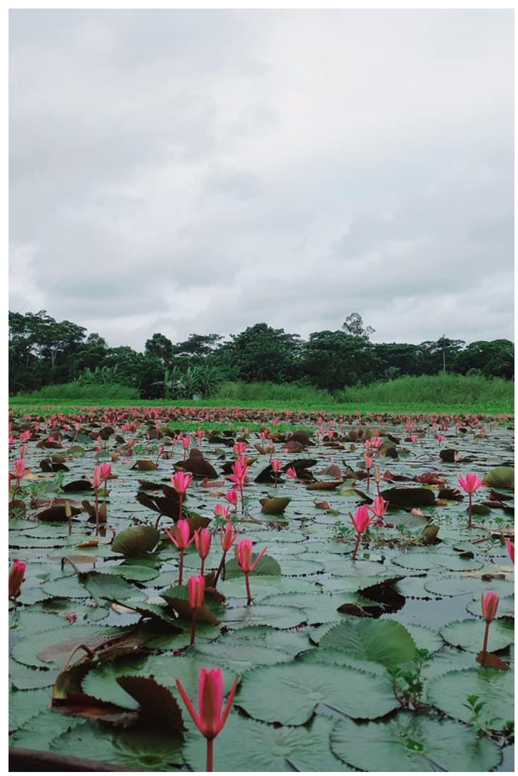

Roubon Binnoor's বন পাহাড় আর খাল বিলের দেশে ঘুরে ফেরা

আমাদের দেশে উত্তর আর দক্ষিনে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র বিভিন্ন ঋতুতে নতুন রূপ রঙে একেবারেই যেন আলাদা। শরতের রূপটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের কারণ এ সময় শরতের মেঘমালাদের সাথে সবুজ বনানী আর বন পাহাড়ের মেলামেশা আমাদের প্রকৃতিকে আরও মোহনীয় করে তোলে। তাই এই সময়টাকেই বেছে নিলাম প্রকৃতির রূপমাধুর্য্য দেখবার জন্য আর চলে গেলাম সিলেটের ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরের পাহাড়ি নদী, বরিশালের উজিরপুরের শাতলার লালপদ্মের বিল আর পিরোজপুর স্বরূপকাঠির খালবিলে জড়ানো পেয়ারা বাগান।

পেয়ারা আর আমড়ার বাগানের মাঝে এঁকেবেঁকে যাওয়া খালের জল ।

গাছ গাছালির মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া খালে ডিঙি নৌকোর মাঝি।

শরতের মেঘ আর পাহাড়ি নদীতে আমার দেখা।

মেঘালয় পাহাড়ের কোল ঘেষে বিছিয়ে থাকা ছোট একটি পাহাড়ি লেক।